Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, published on April 2024, Page No. 370 - 380
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

কয়লাখনি অঞ্চলের মৌখিক সাহিত্যে প্রতিফলিত সমাজ ও সংস্কৃতি

দীপ নারায়ন নায়ক
শিক্ষক, তিলকা মাঝি আদিবাসী প্রাথমিক বিদ্যালয়
পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ
Email ID: deepnarayannayak6@gmail.com

Received Date *16. 03. 2024*
Selection Date *10. 04. 2024*

Keyword
Culture, Region, Rahad, Utsav, Raniganj, Vadu, Mine, Nationalizatio.

Abstract
In this article discuss about the oral literature. Society and culture as reflected in the Oral Literature of the coal mining region. Every place has its own culture. This culture expressed in the language, words and usage of the village population is the poetry of the joys and pains of rural life. Regional people's food habits-clothes-life struggle, Puja-Parban, folk festivals are all folk style. Proverbs, seasonal and nature sayings also influence culture. The language and culture of the three river coal industrial areas of Ajay Damodar and Barakar are different from other parts of West Bengal. Coal mining actually carries a mixed cultural heritage. Festivals like Bandna, Sharidiya Dansha, Baha, Karam have been going on for a long time among the tribal-Santals, the original inhabitants of the region. Therefore, the language, song or oral literature of the region has a place for multilingual people. Common people's interest in coal mining is constant. Workers associated with the hard life of mining try to find their happiness as nature changes. Music is the medium of that joy. This is how the oral literature of the coal mining region is reflected through folk rhymes and songs.

Discussion

ভারতের সবচেয়ে প্রাচীন ও সমৃদ্ধ কয়লাখনি বলতে পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমাঞ্চলকেই বোঝায়। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত পশ্চিম বর্ধমান জেলার রানিগঞ্জের সন্নিহিত অঞ্চল দামোদরের ওপারে ভুলুই গ্রামের অধিবাসী পিতা পুত্র জগদ্রাম রামপ্রসাদ আঠারো শতকে যথাক্রমে রামায়ণ ও কৃষ্ণলীলামৃতসিন্ধু রচনা করেছিলেন। জগদ্রাম রচিত রামায়ণের নাম ‘জগদ্রামী রামায়ণ’। বিখ্যাত বাংলা সাহিত্যিকদের রচনায় রানিগঞ্জের নাম লক্ষ করা যায়। অবশ্য শিল্পাঞ্চল হিসাবে সাহিত্যের আঙ্গিনায় প্রকাশিত হয় বিশ শতকেই। বর্ধমান-রাঢ়ভূমিতে মঙ্গলকাব্যের ধারা সতেরো শতক থেকেই প্রচলিত ছিল। উনিশ শতকে কিছু ছড়া ও লৌকিক কাহিনি কয়লা উত্তোলনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। এগুলির লিখিত রূপ খুব কমই পাওয়া যায়;

অধিকাংশই ছিল মৌখিক। প্রতিটি স্থানের একটি নিজস্ব সংস্কৃতি থাকে। গ্রামের জনগোষ্ঠীর মুখের ভাষায়, কথায়, ব্যবহারে প্রকাশিত এই সংস্কৃতিই গ্রামীণ জীবনের আনন্দ-বেদনার কাব্য। আঞ্চলিক জনগোষ্ঠীর খাদ্যাভ্যাস-পোশাক-জীবন সংগ্রাম, পুজো-পার্বণ, লোকউৎসব এই সবই লোকজ ধারা। প্রবাদ-প্রবচন, ঋতুগত ও প্রকৃতিগত কথাও সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করে। অজয় দামোদর ও বরাকর এই তিন নদী বেষ্টিত কয়লা শিল্পাঞ্চলের ভাষা ও সংস্কৃতি পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য অংশের তুলনায় পৃথক। খনি অঞ্চলের প্রেক্ষিতে রাঢ়ের নির্দিষ্ট সীমানা রয়েছে। বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও অধ্যাপক মিহির চৌধুরী কামিল্যার মতে—

> "আমি রাঢ়কে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করেছি— 'পশ্চিমরাঢ়' ও 'পূর্বরাঢ়'। পশ্চিমরাঢ় বলতে বুঝিয়েছি— সমগ্র বাঁকুড়া, বীরভূম ও পুরুলিয়া জেলা, মেদিনীপুরের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ এবং বর্ধমান জেলার পশ্চিমাংশ।"[১]

বর্ধমান জেলার পশ্চিমাংশ বা পশ্চিম রাঢ়ই কয়লাখনি অঞ্চল। খনি অঞ্চলের মালভূমিময় উঁচু-নীচু ভূ-প্রকৃতি ও পরিবর্তনশীল জলবায়ু মানবজীবনে যথেষ্ট প্রভাব ফেলে। এই অঞ্চলের অপ্রীতিকর জলবায়ুতে মানুষের জীবনযাত্রা কষ্টের। একটি কঠিন কাজ করতে হলে উপযোগী শক্তি সঞ্চয়ের জন্য দৈবিক শক্তির ওপর বিশ্বাস জন্মায়। তাই শক্তি সাধনায় উদ্দেশ্যে সকলে মিলিত হয় দেবদেবীর আরাধনায়। এই ধর্মবিশ্বাসকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে আচার-অনুষ্ঠান, পূজা-পার্বণ, সর্বোপরি একটি সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল। এই পরিমন্ডলকে ঘিরে আবর্তিত হয় লোকজীবন। ড. সর্বজিৎ যশ তাঁর 'বর্ধমান শহরের লৌকিক দেবদেবী' প্রবন্ধে বলেছেন—

> "অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোনো নির্জন প্রান্তরে, খোলা আকাশের নীচে বা নদীর তীরে, গাছের তলায়, সিঁদুর-লেপা পাথরের খন্ড বা স্তূপীকৃত মাটির হাতিঘোড়া এঁদের প্রতীক। এঁদের পুজোয় উচ্চারিত হয় না কোনো বৈদিক মন্ত্র, প্রয়োজন হয় না কোনো ব্রাহ্মণ পুরোহিতের।"[২]

পশ্চিম বর্ধমান জেলায় বিপদ থেকে বাঁচার জন্য এখানকার বসবাসকারী মানুষরা দেবী চন্ডী, শীতলা দেবী প্রভৃতি লৌকিক দেবদেবীর পুজো করে। বর্ধমান জেলার অন্যতম দেবী মা মনসা। মনসা পুজো সাধারণত প্রাঙ্গনে মনসা গাছের পাতাসহ ডালে হয়ে থাকে। আবার অনেক স্থানে মূর্তিরও প্রচলন আছে। চিচুড়িয়ায় শ্রাবণ সংক্রান্তিতে ধর্মরাজ মন্দিরের পাশে শাউডালি মনসা পূজা হয়। দেবীকে গ্রামবাসী নিয়ে আসে —

> "মাকে আনতে চলরে অজয় নদীর কূল
> মায়ের হাতে দেব চাঁদমালা চরণে পদ্মফুল।"[৩]

পশ্চিমাঞ্চলে দেবী মনসাকে ঘিরে যেসব উৎসব হয়ে থাকে তার মধ্যে 'ঝাঁপান' অন্যতম। গবেষক সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন-

> "মনসাকে ঘিরে সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব ঝাপান। এর প্রধান আকর্ষণ সাপখেলা। এর দুটি প্রকারভেদ— গাড়ি ঝাপান ও বাঘ ঝপান। তবে আমাদের এই খনি অঞ্চলে ঝাপান অনেকটা তরজা বা কবি গানের মতো। মনসামঙ্গলের কাহিনী অবলম্বনে এগুলি বলা হয়। রাঢ় বাংলার এই ঝাপান নিয়ে গুণীনদের প্রতিযোগিতা বহু জায়গায় দেখা যায়। মানুষের প্রচলিত বিশ্বাস মা মনসা ভয়ের দেবী। ...তাই যারা সব সময় পথে-ঘাটে-খালে-বিলে-নদী-নালায় কাজ করে তারাই মা মনসাকে উপাস্য বলে মনে করে।"[৪]

এই অঞ্চলের অন্যতম প্রধান পূজিত দেবতা হলেন ধর্মঠাকুর। নিম্নসমাজে ধর্মঠাকুর সন্তানদানকারী হিসাবেই পূজিত হন। অনেক গ্রামে যমরাজের সঙ্গে মিলিতরূপে ধর্ম ঠাকুরের পূজা হয়ে থাকে। এছাড়া পূজা হয় সন্ন্যাসী নামে লোক দেবতা, যিনি গোঁসাই বাবা নামেই অধিক পরিচিত। ভৈরব হলেন গ্রাম্যদেবতা; কাল ভৈরব, বটুক ভৈরব প্রভৃতি নামে রাঢ় অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে পূজিত হন।

খনি আবিষ্কার হওয়ার পূর্বে আজকের শিল্পাঞ্চল ছিল কৃষি প্রধান দেশ। তাই তাই বেশিরভাগ উৎসব কৃষিকে কেন্দ্র করেই হত। কৃষি সম্পদের অধিষ্ঠিত দেবতা ও অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মী ও অন্নপূর্ণার পূজা হত। লৌকিক দেবদেবী ছাড়াও নদ, পাথর প্রভৃতি শক্তি মনে করে পুজো করা হত। প্রাবন্ধিকের মতে -

> "গ্রাম দেবতা কোন বিশেষ গ্রামের গ্রাম্য দেবদেবী এবং অপরপক্ষে আঞ্চলিক দেবদেবী বলতে বোঝায় বহু গ্রামে যখন একটি দেবতা বা দেবীর আরাধনা করা হয়। আঞ্চলিক দেবতার পূজার ব্যাপ্তি একটা অঞ্চল জুড়ে আছে। সেই অর্থে ধর্মরাজ ও মনসা গোঁসাই ভৈরব গ্রামদেবতা; বাকি অন্যান্য যাঁদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলি আঞ্চলিক দেবতা। তবে এনারা সকলেই রাঢ় বাংলার প্রান্তিক দেবদেবী। এদেরকে দিয়েই রাঢ় বাংলার মানুষের লোকধর্ম পালিত হয়।"[৫]

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 49
Website: https://tirj.org.in, Page No. 370 - 380
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

আদিবাসীরা বৃক্ষ, শিলা পূজা করত যা আজও অব্যাহত। পূজায় বা উৎসবে সাঁওতাল রমণীরা শরীর দুলিয়ে নাচতো আর পুরুষরা ধামসা, করতাল, মাদল, বাঁশি বাজিয়ে মাতিয়ে রাখতো তাদের গ্রামকে; যার সুর বয়ে যেত শাল-মহুয়া-পিয়ালের জঙ্গলের মধ্যে। আদিবাসীদের দেব-দেবী ধারণার মধ্যে শুভ শক্তি চিন্তা আছে। আর 'বঙ্গা' অশুভ শক্তির প্রতীক। ভাদ্র মাসের শুক্লা একাদশীর দিন গোটা রাত ধরে নাচ গান ও মদ্যপানের মধ্য দিয়ে পালিত হয় করম পরব। বসন্তকালীন বাহা পরব। এই বড় পালন না করে সাঁওতালদের মহুয়া ফুল খাওয়া নিষেধ। কোটালডিহিতে এদের আরেক উৎসব ছাতা পরব ভাদ্র সংক্রান্তিতে নাচ ও গানের মধ্য দিয়ে পালিত হয়। পরদিন অর্থাৎ আশ্বিন মাসের প্রথম দিনটিতে পালিত হয় উল্টো ছাতা পরব। সাঁওতালদের সবচেয়ে বড় উৎসব বাঁধনা। তবে এই উৎসব কার্তিক মাস থেকে শুরু করে পৌষ মাস পর্যন্ত এই দুই মাস বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এদের মধ্যে সাঙ্গা প্রচলিত। স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্ত বা বিধবা নারীর দ্বিতীয় বার বিয়েকেই এই নামে অভিহিত করা হয়। এক্ষেত্রে সাদা ফুলে তিনবার সিঁদুর লাগিয়ে কনের খোঁপায় ফুলটি গুঁজে দেওয়া হয়।

সাঁওতাল আদিবাসী ছাড়াও আরেক সম্প্রদায়কে খনি অঞ্চলে পাওয়া যায় তারা হলো পাহাড়িয়া; এরা দেহরী, মাঝি, মালতো, পাহাড়িয়া প্রভৃতি পদবীর হয়ে থাকে। শিকার ও স্বল্প কৃষিকাজের মাধ্যমে জীবন অতিবাহিত করলেও সমতলে লুঠতরাজ করে জঙ্গলে লুকিয়ে যেত। পরবর্তীকালে রানিগঞ্জ খনিতে কাজে যুক্ত হয় তবে সংখ্যা খুবই কম। তবে এরা গোষ্ঠীবদ্ধভাবে শহর থেকে দূরে বাস করে। ব্যাভিচারিণী স্ত্রীর বাঁচার অধিকার নেই এই সমাজে। তবে বিধবা বা বিবাহ বিচ্ছিন্নার পুনরায় বিয়ের অধিকার আছে। ভাদ্র মাসে এরা করম পুজো করে। কুমারী ও বন্ধ্যা নারীরাই এই পুজোর যোগ্য। সন্তানবতীদের নিষেধ। এছাড়াও মনসা ও সূর্য পূজাও করে।

শিল্পাঞ্চলে ভাদু পুজোর মতো গরু বাগালদের ঘেটু পূজা হয়। এই পূজায় সন্ধ্যায় 'গোলা ঘর' (গরুর মালিকের ঘর) ও পাড়ায় গিয়ে নাচতে নাচতে ছড়া বলে -

"ঘেঁটু ঘেঁটু লড়ে
বোল রাম
তালতলেতে পলুই নাচে
বোল রাম
পলুই লয়ে জোড়া কাঁধি
বোল রাম
হামলোগকে থোক বান্ধি
বোল রাম ...
ধোবা ঘাটে জল খেয়ে
বোলরাম
মোষ পড়লো ধরাম দিয়ে
বোল রাম।"[৬]

গ্রাম মাত্রই উৎসবমুখর। একটি পূজা বা অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে মেলা গড়ে ওঠে। রানিগঞ্জ কয়লাখনি অঞ্চলে বহুধরনের মেলা হত। এখনও হয়ে থাকে। প্রাবন্ধিকের দেওয়া একটি তালিকা অনুসারে মেলাগুলির সংখ্যা কম নয় —

> "পূজানুষ্ঠান ও লোক- উৎসব উপলক্ষ্যে বৎসরের বিভিন্ন সময়ে খনি অঞ্চলে ১২৬টি মেলা অনুষ্ঠিত হয়। সেগুলি হল- ক. চড়ক ও গাজনের মেলা ১৩টি। খ. শিবপূজা উপলক্ষে মেলা ১৪টি। গ. ধর্মঠাকুরের পূজা উপলক্ষ্যে মেলা ১৩ টি। ঘ. কালীপূজার মেলা ১০টি। ঙ. দুর্গাপূজার মেলা ৮টি। চ. বিভিন্ন শক্তিদেবীর পূজা উপলক্ষে মেলা ১১টি। ছ. গ্রাম্য ও লৌকিক দেবদেবীর পূজা উপলক্ষে মেলা ৭টি। বৈষ্ণবদের উৎসব উপলক্ষে মেলা ২১টি। ঝ. মুসলমান সম্প্রদায়ের মেলা ৭টি। ঞ) পৌষ সংক্রান্তি মেলা ৬টি। ট. আদিবাসী সম্প্রদায়ের উৎসব উপলক্ষ্যে মেলা ৪টি ও বিবিধ বিষয়কে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত মেলা ১২ টি।"[৭]

রানিগঞ্জ আসানসোল অঞ্চলে যাত্রাপালার একটি পরিবেশ আছে। বিশ শতকে নিয়মিত যাত্রাপালা হত। এছাড়া নাটক, পালাগান এগুলিরও প্রচলন ছিল। প্রাবন্ধিকের বক্তব্যে সেই সময়টি ধরা পড়েছে -

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 49
Website: https://tirj.org.in, Page No. 370 - 380
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "এই খনি মঞ্চে যে কয়টি যাত্রাপালা মঞ্চস্থ হয়েছিল তার মধ্যে সেরা যাত্রা নাটকগুলি হচ্ছে— তাড়কাসুর বধ, ছিন্নশির, সোনাই দিঘি, অশ্রু দিয়ে লেখা, ধূলার স্বর্গ, দীপ আজিও জ্বলে, একটি পয়সা, ভুল, পদধ্বনি। তাছাড়া মাস্টারদা সূর্যসেন, প্রভাস অপেরার বিপ্লবী ভিয়েতনাম ও লোকনাট্যের পাগলা গারদ যাত্রাপালাটি খনি মালিকদের উদ্যোগে সর্বশেষ যাত্রাপালা।"[৮]

খনি মালিকদের তৎপরতায় বিভিন্ন ফ্রি-শো, জলসা ইত্যাদি যাত্রাগানের পরিবর্তে শুরু হয়। অন্যান্য নগরী ও শিল্পাঞ্চলের সঙ্গে খনি শিল্পাঞ্চলও প্রতিযোগিতায় মেতে ওঠে -

> "লস্করবাঁধ খনিতে জাতীয়করণের পর শ্রমিকদের উদ্যোগে কালীপূজা উপলক্ষ্যে প্রথম শুরু হয় 'নট্ট কোম্পানি' - একঝাঁক তারকা শিল্পী সমন্বয়ে।"[৯]

খনি অঞ্চলে বিভিন্ন লোকনৃত্য প্রচলিত ছিল। সাত-আট জনের দল মিলে এই নাচ হত। 'কাঠিনাচ' প্রসঙ্গে লোক সাহিত্য গবেষক অমর চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন —

> "রাঢ় বাংলার পশ্চিম ভূখণ্ডে 'কাঠিনাচ' বলে এক ধরণের লৌকিক নাচের প্রচলন আছে, যা শুধু কয়েকটি অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ। সাধারণত দুর্গাপুজোর পর এখানকার গ্রামগুলিতে অনুন্নতবর্গের মানুষজন— বিশেষ করে বাউরি সম্প্রদায়ের লোকেরা 'পার্বণি' আদায়ের উদ্দেশ্যে কাঠিনাচ দেখতে বের হতেন। এখনো কোনো বিশেষ মেলাতে বা পঞ্চায়েতের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে কাঠিনাচ দেখতে পাওয়া যায়।"[১০]

পশ্চিমবঙ্গের কয়লাখনি অঞ্চল প্রথম দিকে ছিল কৃষিপ্রধান। কয়লাখনি আবিষ্কারের ফলে পরবর্তীকালে কয়লা খনিতে অনেকেই জীবিকা গ্রহণ করে। খুব স্বাভাবিক ভাবেই একটি অঞ্চলের প্রাকৃতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক দিকের ওপর নির্ভর করে ওই জনগোষ্ঠীতে বেশকিছু ছড়া, প্রবাদ, গান লক্ষিত হয়। কালো মাটির সঙ্গে কালো মেয়ের বন্ধন ঘটিয়েছে এই প্রবাদটি -

"কুঁদল মেয়ে কোঁ কোঁ কইরে -
কোঁদল ছাড়া রইতে লারে।"[১১]

জঙ্গলাকীর্ণ গ্রাম ধীরে ধীরে পরিণত হয়েছে শহরে। শিল্পাঞ্চল শহরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠছে দোকান, হোটেল, সরাইখানা। সাধারণ মানুষ, খনিকর্মী যাদের 'দিন আনি দিন খাই' জীবনে ভালো খাওয়ারও সখ জন্মে। তাই মাছের ঝোল খাওয়ার জন্য গ্রামবাসীরা আসানসোল যেতে চায় -

"খাড়ি, ঝিঙা, মাছের ঝোল
খাবি তো চল আসানসোল।"[১২]

অথবা

"হিজলগড়া জামশোল
বাদলপুর তালতোড়
ঘটি বাটি মাথায় তোল
চল যাবি সত্তোর।"[১৩]

আসানসোল ও পুরুলিয়া অঞ্চলে ভাদু উৎসবের বিশেষ গুরুত্ব আছে। কাশীপুর পঞ্চকোটের রাজ পরিবারের রাজকন্যা ভদ্রাবতী ভদ্রেশ্বরী। আদরের নাম ভাদু। ভাদু'র অকাল মৃত্যু সম্পর্কে অনেক মত আছে। শোকগ্রস্ত রাজা বিশ্বম্ভরশেখর (১২২২-৫৪ খ্রিস্টাব্দ) ভাদ্র সংক্রান্তির পূর্বদিনে কন্যাকে দেবী মনে করে পুজো (১২৫৫ খ্রিস্টাব্দ) করেন। এই ভাবে রাজার মধ্য দিয়ে গ্রাম, গ্রাম থেকে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। পরবর্তীকালে ভাদু ফসলের দেবীরূপেই পূজিত হয়ে আসেন। অবশ্য পুরুলিয়াবাসী রাজকন্যাকে নিজের ঘরের মেয়ে মনে করে আপন করে নিয়েছে। তাই ভাদুকে নিয়ে গান রচিত হয়েছে -

"কাশীপুরের মহারাজা
সে করে ভাদু পূজা
সন্ধ্যা হলে ঝাড়ুল বাজে
হাতে দেয় ফুল বাতাসা।।"[১৪]

কয়লাখনি শুরু হওয়ার সময় খনি খোঁড়া হলে অনেক জল বের হত। সেই জল তোলার জন্য টব লাগতো তা দেখার জন্য ভিড় জমতো। পশ্চিম বর্ধমানে ভাদু খুব আদরের। তাই মেয়েদের ভাদুর সাথে তুলনা করে গান করা হয়েছে -

"চল ভাদু চল খেলতে যাবো
রাণীগঞ্জের বড় তলা
অমনি পথে দেখাই আনবো
কয়লাখাদে জল তোলা।"[১৫]

রানিগঞ্জের গয়নার কারুকার্য ও নকশার বিশেষ সুনাম ছিল। তাই শুধু কয়লা তোলাই নয় ভাদু (কন্যা) রানিগঞ্জের গয়না নেবে আবদার করেছিল। কিন্তু অর্থাভাবে দিতে না পেরে ঘরের প্রতিটি মানুষের মনে দুঃখ -

"আমার ভাদু বলেছিল
আধ গাঁয়ের শাড়ি নিব
রানীগঞ্জের গয়না নিব
তবে বাড়ি যাবো
বাপ বলে বিদায় বিদায়
মায়ের ছাতি ফেটে যায়
ভাই বলে ছোট বোনটি
পাছে রাস্তা কেঁদে যায়।।"[১৬]

পুরুষকর্মীর সঙ্গে নারীরাও একই সাথে কাজ করত কলয়ারিতে। পুরুষদের মতো গরমে ঘামে ভিজে মেয়েদের চেহারায় পরিশ্রমের ছাপ পড়ত, যা মায়ের কাছে কখনোই কাম্য নয়। তা নিয়ে গান -

"আর কিসের ভাবনা করি
আমার ভাদু খুইঁলেছে কলিয়ারী...
ভাদু যখন খাদে নামে গো
সনার অঙ্গ হয় কালি।
আবার সনার অঙ্গ ফর্সা হলে
মনে হয় গো রাজদুলালি।"[১৭]

ভাদুকে নিয়ে তৈরি এই গানগুলি খনিজীবনের এক জীবন্ত দলিল হয়ে উঠেছে। ভাদুকে সাজাবার জন্য রানিগঞ্জের থেকে আমলা ও মেথি গায়ে ও মাথায় মাখিয়ে দেহে ঔজ্জ্বল্যভাব আনার জন্য -

"নতুন শাড়ি বেলাউজে ভাদু বসেছে পিঁড়িতে
রাণীগঞ্জের আমলা মিতি দিব ভাদূর মুটুকে
দেশ জুড়ে মা লোক আস্যেছে
ভাদু মাকে দেখিতে।"[১৮]

অবশ্য ভাদুর উজ্জ্বলতা ম্লান হয়নি। খনিতে কাজ বেশ কষ্টকর। তাই ভাদুকে লেখাপড়া শিখিয়ে শিক্ষিত করার জন্য বাবা-মায়ের বিশেষ চেষ্টা। কয়লা সহিল্পকে কেন্দ্র করে যেসমস্ত শিল্পগুলি গড়ে ওঠে তাদের মধ্যে অন্যতম দুর্গাপুর স্টীল প্ল্যান্ট (DSP), যেখানে ভাদু অপেক্ষাকৃত আরামে থেকে কাজ করতে পারবে। সাম্প্রতিক কালে ভাদুকে নিয়ে গান লেখা হচ্ছে -

"আমার ভাদু রূপের ছটা গো
লেখাপড়া জানে না
সাক্ষরতার কেন্দ্রে দুব
শিখবে কত, ঠকবে না
দুর্গাপুরে যাবেক ভাদু
ইষ্টিলে কাজ করবে গো
দেদার টাকা আনবে ভাদু
ঘরে অভাব থাকবে না।"[১৯]

পশ্চিমবঙ্গের আবহাওয়া, জলবায়ু, প্রকৃতি, নদ-নদী নিয়ে লোকপ্রবাদ গড়ে উঠেছে। শুধু তাই নয় কয়লার অনুষঙ্গে অনেক প্রবাদ গড়ে উঠেছে যেমন এই অঞ্চলের প্রধান নদী দামোদর। দামোদর সে যুগে ছিল দুঃখের নদ। বর্ষাকালে প্রায়ই বন্যা ঘটত। তাই বর্ধমানবাসী কখনো সন্তানরূপে অভিযোগ জানায় কখনো বা দেবতা মেনে অনুযোগ করে; যেগুলি আজ প্রবাদে পরিণত হয়েছে -

"ওরে নদ দামোদর
তোকে নিয়ে আতান্তর।"
অথবা,
"ওহে দামোদর
তুমি ঈশ্বর
ভাসাইলে ঘর
এ দুর্দিনে।"[২০]
"রাঢ়ের নদী সিক্রানি
ভালোবাসার টানাটানি।"[২১]
"দুধ দেওয়া গয়লা
গা যেন কয়লা।"[২২]
"যতই কর শিবসাধনা
কলঙ্কিনী নাম যাবে না।"[২৩]

এই প্রবাদগুলির মধ্যদিয়ে রাঢ়ের খনি অঞ্চলের বিশেষত্ব ফুটে উঠেছে। দামোদর নদের মতো সিক্রিরানি নদীরও রাঢ় অঞ্চলে গুরুত্ব রয়েছে। তাই নদী সিক্রিরানীকে নিয়েও অনেক প্রবাদ গড়ে উঠেছে। এছাড়া কয়লা অঞ্চল হওয়ায় সবকিছুর মধ্যেই কালো কয়লার সাদৃশ্য করা হয় যেমন এখানে গয়লা'র সঙ্গে করা হয়েছে। এ রকম একটি উদাহরণ বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক তুলে ধরেছেন —

> "জামুড়িয়ার বাউরি সম্প্রদায়ের ঝুমুর গান ছিল বিখ্যাত এবং জামুড়িয়ার বাজার হাটও পুরনো দিনের। প্রবাদ ছিল - 'নাচবি ঝুমুর যা জামুড়ে' অথবা 'খাও আমানি যাও দোমানি।"[২৪]

অনেক মৌখিক ছড়ার মধ্যে খনি অঞ্চলের জায়গা ও গ্রামগুলির নাম উঠে এসেছে। কয়লাখনিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা নতুন গ্রাম ও পথঘাটের দিক নির্দেশও পাওয়া যায় -

"জানি না ইটাপাড়া
সামডি-বোলকুঁড়া,
আছড়া-পাতাল-ফুলবেড়া
সামডি বোলকুঁড়া
ডাইনে রেখে এথোড়া
পার হবি তুই নুনি— চিচুড়া,
জানিনা ইটাপাড়া
সামডি বোলকুঁড়া।"[২৫]

এই ছড়াটিতে গ্রামগুলির সীমানা বর্ণিত হয়েছে। চিচুড়া, ইটাপাড়া, সামডি, বোলকুঁড়া, এথোড়া নামগুলি শিল্পাঞ্চলের স্থানের নাম। অপর দিকে জামশোল উখরা এগুলি কয়লাখনি তথা খনিসংলগ্ন গ্রামের নাম -

"চাক দোল দোল বাদল দোল,
হিজলগড়া জামসোল,
নাচন-পারুলে, আমরাই আর কুণ্ডুলে,
উখরা-খাদরা, তিলাবনি-ঝাঝরা,
বেঁশে আর সরপি
ঘুরে ঘুরে মরবি।"[২৬]

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 49
Website: https://tirj.org.in, Page No. 370 - 380
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ছড়াগুলির মধ্য দিয়ে শিল্পাঞ্চলের খনিজ পরিবেশ, প্রতিনিয়ত সুখ-দুঃখের প্রতিচ্ছবি, সামাজিক অবস্থানও সব মিলিয়ে আঠারো থেকে বিশ শতকের খনি অঞ্চলের কথকতা বর্ণিত হয়েছে। অবশ্য এই ছড়া বা গানগুলি লোকমুখে বেশি শোনা যেত। এত প্রাচীন একটি শিল্পকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা গান-প্রবাদ-ছড়া এখনো সংকলিত হয়নি; টুকরো টুকরো পরিসরে সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে মাত্র।

"আয়রে দাদা, নিমাই দাদা
যাদের অলিগলি।
কয়লাকাটা বিষণ্ণ ঘাটালিরে।
তাও না মিটিল আমার
পেটের কলকলি।"[২৭]

শ্রমিকদের ওপর মালিকদের অত্যাচার যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। অনেক পরিশ্রম করেও খনিশ্রমিকদের সময় খাবার মেলে না। পরিশ্রম না করলে চাকরিও ছিল অনিশ্চিত। তাই খিদে পেলেও খিদে নিয়েই কাজ করতে হত শ্রমিকদের। আবার নীচের গানটির মধ্যে খনি শ্রমিকদের ওপর কঠোর পরিশ্রম আরোপ করার কথা ব্যক্ত হয়েছে। এ পরিস্থিতিতে খাওয়ার উপায় থাকতো না। হয়ে অসুস্থ হয়ে পড়তো শ্রমিকরা। শ্রমিকদের এই কষ্টকর দিকটি গানের মধ্যে তুলে ধরা হয়েছে -

"রিমিঝিমি মাথা দুখা
ভাদু কাঁকড় খাঁইয়ে কাজ কুইরেছে
ডাক্তার আন্যে হাত দেখা।"[২৮]

কাঁকর ও পাথর বেষ্টিত খনি অঞ্চলের রাস্তা-ঘাট যখন শহরের ন্যায় গঠন করা হতে থাকে সরল খনি শ্রমিকদেরও খনিমালিকদের প্রতি আবদার -

"সাহেব, দে বে টাকা, দামী রাস্তা বাঁধাব
তুলে দিব হাঁপা কাঁকর, উপরে বালি ছড়াব।"[২৯]

গানগুলি যেন আঞ্চলিকতাকে অতিক্রম করে গোটা দেশের সম্পদ।

পশ্চিম বর্ধমান জেলায় ভাদুগান প্রচলিত। ভাদুকে নিয়ে বহু মিথ রয়েছে এই অঞ্চলে। এই অঞ্চলে কয়লা আবিষ্কার হলে কয়লাকে কেন্দ্র করে ভদুকে নিয়ে গ্রাম্য মেয়েরা গান করে -

"আমার ভাদু ওপাড়ে গেছে
কালো পাথর কাটতে
এতো কেন বেলা হোলো
অজয়ে বান পড়েছে
অজয়ে বান পড়ুক পড়ুক
মিঠাই ভেঙ্গে জল খাবো...।"[৩০]

ভাদুর মতোই টুসু রাঢ় অঞ্চলের আরেক লোক উৎসব। পৌষ সংক্রান্তিতে টুসু গড়ে মেয়েরা বাড়ি বাড়ি গান করে। ফসলকে কেন্দ্র করে এই উৎসব। এই অঞ্চলের সম্পদ টুসু গানের মধ্য দিয়ে নারী নির্যাতন প্রকাশ পেয়েছে। বাপের বাড়িতে ফিরে গান গেয়েছে -

"ই-চালে পুঁই, উঁ চালে পুঁই, খাব পুঁই এর খিচুড়ি
আর যাবো না শ্বশুর বাড়ি, ধরে ঠুকবেক শাশুড়ি।"[৩১]

ভাদুর মতো টুসুকে নিয়ে আদরের গান আছে। মেয়েকে ভালো স্কুলে পড়িয়ে শিক্ষিত করে স্বনির্ভরশীল করে তোলার স্বপ্ন প্রতিটি পিতা-মাতার মনে রয়েছে -

"আমার টুসু রূপবতী
ইস্কুলেতে পড়াবো
শ্বশুরবাড়ি
যাবেক টুসু

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 49
Website: https://tirj.org.in, Page No. 370 - 380
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

মোটরগাড়ি চড়াবো।”[৩২]

শ্রমের সঙ্গে প্রেমের একটি সম্পর্ক আছে। এখানে যৌনতারও একটি স্থান আছে। পরিশ্রমের কঠোরতা লাঘবে এই গানগুলোর বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। ভারী কাজ করতে যে পরিশ্রম হয় বিশেষ করে কয়লা বোঝাই টবগাড়ি ও কপিকল চালানো। তখন শ্রমিকরা নারীদের উদ্দেশ্যে সমবেতভাবে গাইতো -

“টপ টপা টপ ঝিঙার বীচ
হাঁইও...
ঝিঙা গেল বাপের বাড়ি।
হাঁইও...
পইরে আইল ঢাকাই শাড়ি।
হাঁইও...
ঢাকাই শাড়ি পইরে ঝিঙা।
হাঁইও...
কইরতে গেল নতুন সাঙা।
হাঁইও...।”[৩৩]

এখানে ‘ঝিঙা’ আসলে নারীর প্রতিকৃতি। দ্বিতীয়বার বিয়ে হল সাঙ্গা। পুরুষের কাছে কৃষ্ণ বর্ণের আদিবাসী নারী ঢাকাই শাড়ি পরে রূপসী হয়ে ওঠে। নারীর প্রতি শ্রমিকদের প্রেম আকুলতা এই গানে গড়ে উঠেছে -

“আমার ভাদুর ডাগর খোঁপা,
মন দিলে মন পুড়ে না।
কয়লাকুঠির কালো ভাদু
মন না দিয়ে যেও না।।”[৩৪]

আনন্দের মাঝেও অর্থহীন, দরিদ্র খনিবাসীর চিত্র আছে। সে সময় সিয়ারসোল রাজবাড়িতে রথের মেলা বসত। আজও এই ঐতিহ্য বহন করে চলেছে বর্তমান সিয়ারসোল শহরটি। সিয়ারসোল রথের মেলা না যেতে পেরে মনে দুঃখ এখানে ছড়ার মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে -

“তুদের হলুদ গা
তুরা রথ দেখতে যা
আমরা পয়সা কুথায় পাবো
আমরা ফিরতি রথে যাবো”[৩৫]

দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন যখন তৈরি হয় সেই ঘটনা নিয়ে খনিবাসীর নানা বিস্ময় প্রতিফলিত হয়েছিল। সাহিত্যিক নন্দদুলাল আচার্য সংগ্রহ করেছেন -

“ও ডি.ভি.সি, ডিভ ডিভিসি
কি করে বাঁধ বাঁধালি
আবার,পাহাড় কাঁটে সুঁদ করিলি
তার নীচে জল বহালি।”[৩৬]

খনিতে কাজ করার উদ্দেশ্যে পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলি থেকে বহু লোক কাজ করতে আসতো। তাই ভিনদেশী শব্দ গানের মধ্যে প্রবেশ করেছে। উভয় ভাষার সংমিশ্রণ লোকসঙ্গীতের জন্ম দিত -

“গোর হোকে গাইলা
লোটকে আহলা কারিয়া
নোকরিয়া পিয়া ছোড় দেমত যা তু কলিয়ারিয়া।।”[৩৭]

প্রবাসী স্বামীর প্রতি গ্রামে একলা সংসারে বাস করা স্ত্রীর অভিমানফুটে উঠেছে গানের মাধ্যমে -

“রহলা ঘরমে খেতি বরিয়া এ বালম।
যাকে কর কোলিয়ারিতে নোকরিয়া,

এ কলম। ..."[৩৮]

ক্লান্তিকর কাজ করতে করতে মনে গ্লানি এলে বান্ধবী বা সইয়ের সঙ্গে হালকা চালে গান করে নারীরা পরিশ্রম লাঘব করে-

"চল গো ফুল, চল গো ফুল,
কয়লা ডিপুতে
না গো ফুল,

না গো ফুল
গতর দুখাছে।"[৩৯]

কয়লাখনি ভেতর অন্ধকারে অধিক পরিশ্রমে ক্লান্তির সুর ধ্বনিত হয়েছে নারীদের কণ্ঠে; যা তাদের প্রাত্যহিক জীবনচর্যার অঙ্গীভূত -

"দাদারে দাদা পাতালপুরী
হাতেতে গ্যাসবাতি মাথায় ঝুড়ি।"[৪০]

খনির সাহেবদের কাছে নারীদের শরীর দিয়ে মাশুল দিতে হত অনেক সময় সেই কথাই সুর করে ব্যঙ্গ ছলে গাওয়া হয়েছে-

"হেরিকেল মেরিকেল
তুদের জামাই খাদের ম্যানেজার।"[৪১]

কিন্তু শরীরে যতই যন্ত্রণা আসুক না কেন কাঁচা টাকার লাভ করার জন্য নারীরা কাজ করতে বাধ্য হয় -

"রেলগাড়ি চলে ভাই
রেলগাড়ি চলে ভাই
চল চলি চলিকে
কোলিয়ারি কামাই।"[৪২]

এই কাঁচা টাকার জন্য কয়লার তথা খনি মালিকেরও সুনাম করে শ্রমিকরা -

"হওবে সোনবা কয়লা আমার
ঝুমি ঝুমি গাবে লোগ গানবা।
...
লকড়ী সে সুন্দর কয়লা জানালা।।"[৪৩]

অনেক সময় নেশার ঝোঁকে খনিশ্রমিকদের মনের অনেক ইচ্ছা ওস্বপ্ন গানের মধ্যে দিয়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সৈনিক প্রেরণের জন্য অনেক স্থানে ছোট ছোট বিমানবন্দর গড়ে উঠেছিল। এরকমই নিঙ্গা কয়লাখনির কাছে একটি 'অ্যারোড্রাম' নির্মাণ করা হয়। সেখানে প্রায়ই জাহাজ ওঠা নামা করতো। তাই স্বাভাবিক ভাবেই বিভিন্ন স্থানের শ্রমিক তথা শিল্পাঞ্চলবাসীর কাছে খুব আশ্চর্যজনক ব্যাপার দেখার ইচ্ছা প্রকাশ পেত -

"সাঁতা যাব মদ খাইতে
নিঙা যাব জাহাজ উড়াতে।"[৪৪]

মদ্যপানের মধ্য দিয়ে নারী ও পুরুষ উভয়েই আনন্দ আবদার ধরতো -

"জাকিট লিব বঁধু সোঁয়া লিবা
দামী দামী শাড়ি
আর মুখে পান
চৈখে চশমা,
হাতে টিফিস্কারী।"[৪৫]

আবার খনি শ্রমিকদের নেশা নিয়ে প্রবাদ রয়েছে -

"সুদ, মদ, জুয়াড়ি
তিন নিয়ে কলিয়ারী"[৪৬]

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 49
Website: https://tirj.org.in, Page No. 370 - 380
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

স্বাধীনতা সংগ্রামকে কেন্দ্র করে সামডির লোককবি অবিনাশ রজক যে লোকগানটি গেয়েছেন কৃষিকাজ ছেড়ে কৃষকদের অর্থের জন্য খনিতে নাম লেখানোর চিত্র ফুটে উঠেছে-

"দেখলাম কাঁকড়তল রসা, কৃষকগণের কি দুর্দশা
কৃষি কর্ম করেন,
বিসর্জন...
সহস্র সহস্র নরে
কেবল মাটি কেটে করছে খনি ভাই রে
ভনে কবি অবিনাশ, বুঝি ভারতবাসীর সর্বনাশ
... দিবস রজনী সব লেবেল করে দিয়েছে।"[৪৭]

পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত এই কয়লাখনি অঞ্চল আসলে একটি মিশ্র সংস্কৃতির ঐতিহ্য বহন করে এসেছে। এ অঞ্চলের আদিম অধিবাসী আদিবাসী-সাঁওতালদের উৎসব যেমন বাঁদনা, শারদীয় দাঁশায়, দোলে বাহা, করম, পৌষে সাকরাৎ এগুলির মধ্য দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। তাই এই অঞ্চলের ভাষা, গান বা মৌখিক সাহিত্যে বহুভাষাভাষী মানুষের বুলি স্থান পেয়েছে। কয়লা খনিকে, নিয়ে সাধারণ মানুষের আগ্রহ নিরন্তর। খনির কঠোর শ্রমজীবনের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিকরা প্রকৃতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের আনন্দ খুঁজে নেওয়ার চেষ্টা করে। সেই আনন্দের মাধ্যম গান। এভাবেই জনসাধারণের লোকমুখে প্রচলিত ছড়া ও গানের মাধ্যমে কয়লাখনি অঞ্চলের মৌখিক সাহিত্য প্রতিফলিত হয়েছে। প্রতিফলিত হয়েছে কয়লাখনি অঞ্চলের মানচিত্র, সমাজ বাস্তবতা ও সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল।

Reference:

১. চৌধুরী, কামিল্যা মিহির, 'রাঢ়ের জনজাতি ও লোকসংস্কৃতি', উচ্চতর বিদ্যাচর্চাকেন্দ্র, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান - ০৪, প্রথম প্রকাশ - ২০০৬, পৃ. ১৫
২. তারাপদ, হাজরা (সম্পাদিত), 'প্রান্তিক রাঢ়ের দেবদেবী', ঐক্য প্রকাশন, পশ্চিম বর্ধমান - ৮১, প্রথম প্রকাশ ২০১৯, পৃ. ১০
৩. তারাপদ, হাজরা (সম্পাদিত), 'প্রান্তিক রাঢ়ের দেবদেবী', পৃ. ১১
৪. তারাপদ, হাজরা (সম্পাদিত), 'প্রান্তিক রাঢ়ের দেবদেবী', পৃ. ১৮
৫. তারাপদ, হাজরা (সম্পাদিত), 'প্রান্তিক রাঢ়ের দেবদেবী', পৃ. ২৯
৬. সামন্ত, জগন্নাথ, 'আসানসোলের ইতিহাস' (দ্বিতীয় খন্ড), পৃ. ৬৩
৭. হাজরা, তারাপদ (সম্পাদিত), 'রানীগঞ্জ : খনি অঞ্চলের ইতিবৃত্ত', প্রান্তর প্রকাশন, পশ্চিম বর্ধমান - ৮১, প্রথম প্রকাশ - ২০০৮, পৃ. ২৪০
৮. হাজরা, তারাপদ (সম্পাদিত), 'রানীগঞ্জ : খনি অঞ্চলের ইতিবৃত্ত', পৃ. ২৯১
৯. হাজরা, তারাপদ (সম্পাদিত), 'রানীগঞ্জ : খনি অঞ্চলের ইতিবৃত্ত', পৃ. ২৯২
১০. চট্টোপাধ্যায়, অমর, 'আসানসোল-দুর্গাপুর অঞ্চলের ইতিবৃত্ত ও তার লোক সংস্কৃতি', যোধন প্রকাশনী, পশ্চিম বর্ধমান - ৩৫, প্রথম প্রকাশ - ২০১৩, পৃ. ১৫৪
১১. হাজরা, তারাপদ, 'কয়লা শিল্পের কথা : রানীগঞ্জ খনি অঞ্চলের ইতিবৃত্ত', ঐক্য প্রকাশনী, বর্ধমান - ৮১, প্রথম প্রকাশ - ২০০৮, পৃ. ২৯৯
১২. বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তিময়, 'আসানসোল পরিক্রমা', ট্রিনিটি ট্রাস্ট, আসানসোল, পশ্চিম বর্ধমান - ৩৫, দ্বিতীয় সংস্করণ - ২০০৫, পৃ. ১৮২
১৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তিময়, 'আসানসোল পরিক্রমা', পৃ. ১৮২
১৪. সামন্ত, জগন্নাথ, 'আসানসোলের ইতিহাস' (দ্বিতীয় খন্ড), পৃ. ৯২
১৫. চট্টোপাধ্যায়, অমর, 'আসানসোল দুর্গাপুর অঞ্চলের ইতিবৃত্ত ও তার লোকসংস্কৃতি', পৃ. ১১৮

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 49
Website: https://tirj.org.in, Page No. 370 - 380
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

১৬. সামন্ত, জগন্নাথ, 'আসানসোলের ইতিহাস' (দ্বিতীয় খন্ড), পৃ. ৯৩
১৭. হাজরা, তারাপদ, 'কয়লা শিল্পের কথা : রানীগঞ্জ খনি অঞ্চলের ইতিবৃত্ত', পৃ. ২৯৯
১৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তিময়, 'আসানসোল পরিক্রমা', পৃ. ১৮১
১৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তিময়, 'আসানসোল পরিক্রমা', পৃ. ১৮১
২০. আচার্য, নন্দদুলাল, 'আসানসোলের ইতিহাস ও সংস্কৃতি', পৃ. ১০৯
২১. হাজরা, তারাপদ, 'কয়লা শিল্পের কথা: রানীগঞ্জ খনি অঞ্চলের ইতিবৃত্ত', পৃ. ২৯৯
২২. হাজরা, তারাপদ, 'কয়লা শিল্পের কথা: রানীগঞ্জ খনি অঞ্চলের ইতিবৃত্ত', পৃ. ২৯৯
২৩. হাজরা, তারাপদ, 'কয়লা শিল্পের কথা: রানীগঞ্জ খনি অঞ্চলের ইতিবৃত্ত', পৃ. ২৯৯
২৪. হাজরা, তারাপদ, 'কয়লা শিল্পের কথা: রানীগঞ্জ খনি অঞ্চলের ইতিবৃত্ত', পৃ. ৩০০
২৫. চট্টোপাধ্যায়, অমর, 'আসানসোল দুর্গাপুর অঞ্চলের ইতিবৃত্ত ও তার লোকসংস্কৃতি', পৃ. ১৬১
২৬. চট্টোপাধ্যায়, অমর, 'আসানসোল দুর্গাপুর অঞ্চলের ইতিবৃত্ত ও তার লোকসংস্কৃতি', পৃ. ১৬০
২৭. আচার্য, নন্দদুলাল (সম্পাদিত), 'আসানসোল লোকসংস্কৃতির একদিক', আসানসোল কবি ও কবিতা সংখ্যা, ট্রিনিটি ট্রাস্ট, পশ্চিম বর্ধমান - ০৩, প্রথম প্রকাশ - ১৪১২, পৃ. ১২
২৮. আচার্য, নন্দদুলাল (সম্পাদিত), 'আসানসোল লোকসংস্কৃতির একদিক', পৃ. ১২
২৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তিময়, 'আসানসোল পরিক্রমা', পৃ. ১৮২
৩০. হাজরা, তারাপদ, 'কয়লা শিল্পের কথা : রানীগঞ্জ খনি অঞ্চলের ইতিবৃত্ত', পৃ. ৩৩৮
৩১. বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তিময়, 'আসানসোল পরিক্রমা', পৃ. ১৮১
৩২. বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তিময়, 'আসানসোল পরিক্রমা', পৃ. ১৮১
৩৩. আচার্য, নন্দদুলাল (সম্পাদিত), 'মৃদঙ্গার প্রবন্ধ সংকলন', পৃ. ৯৮
৩৪. আচার্য, নন্দদুলাল, 'আসানসোল লোকসংস্কৃতির একদিক', পৃ. ১৩
৩৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তিময়, 'আসানসোল পরিক্রমা', পৃ. ১৮১
৩৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তিময়, 'আসানসোল পরিক্রমা', পৃ. ১৮১
৩৭. আচার্য, নন্দদুলাল, 'আসানসোল লোকসংস্কৃতির একদিক', পৃ. ১৪
৩৮. আচার্য, নন্দদুলাল, 'আসানসোল লোকসংস্কৃতির একদিক', পৃ. ১৪
৩৯. আচার্য, নন্দদুলাল (সম্পাদিত), 'মৃদঙ্গার প্রবন্ধ সংকলন', ইস্টার্ন কোল্ফিল্ডস্ লিমিটেড, বর্ধমান - ৪৪, প্রথম প্রকাশ - ১৯৮৬, পৃ. ৯৮
৪০. আচার্য, নন্দদুলাল (সম্পাদিত), 'মৃদঙ্গার প্রবন্ধ সংকলন', পৃ. ৯৮
৪১. আচার্য, নন্দদুলাল (সম্পাদিত), 'মৃদঙ্গার প্রবন্ধ সংকলন', পৃ. ৯৯
৪২. আচার্য, নন্দদুলাল (সম্পাদিত), 'মৃদঙ্গার প্রবন্ধ সংকলন', পৃ. ১০০
৪৩. আচার্য, নন্দদুলাল (সম্পাদিত), 'মৃদঙ্গার প্রবন্ধ সংকলন', পৃ. ১০১
৪৪. আচার্য, নন্দদুলাল (সম্পাদিত), 'মৃদঙ্গার প্রবন্ধ সংকলন', পৃ. ১০১
৪৫. আচার্য, নন্দদুলাল (সম্পাদিত), 'মৃদঙ্গার প্রবন্ধ সংকলন', পৃ. ৯৯
৪৬. হাজরা, তারাপদ, 'কয়লা শিল্পের কথা : রানীগঞ্জ খনি অঞ্চলের ইতিবৃত্ত', পৃ. ৩৩১
৪৭. বন্দ্যোপাধ্যায় শান্তিময়, 'আসানসোল পরিক্রমা', পৃ. ১৮৩